চাকার পতনের জন্য দায়ী কে?

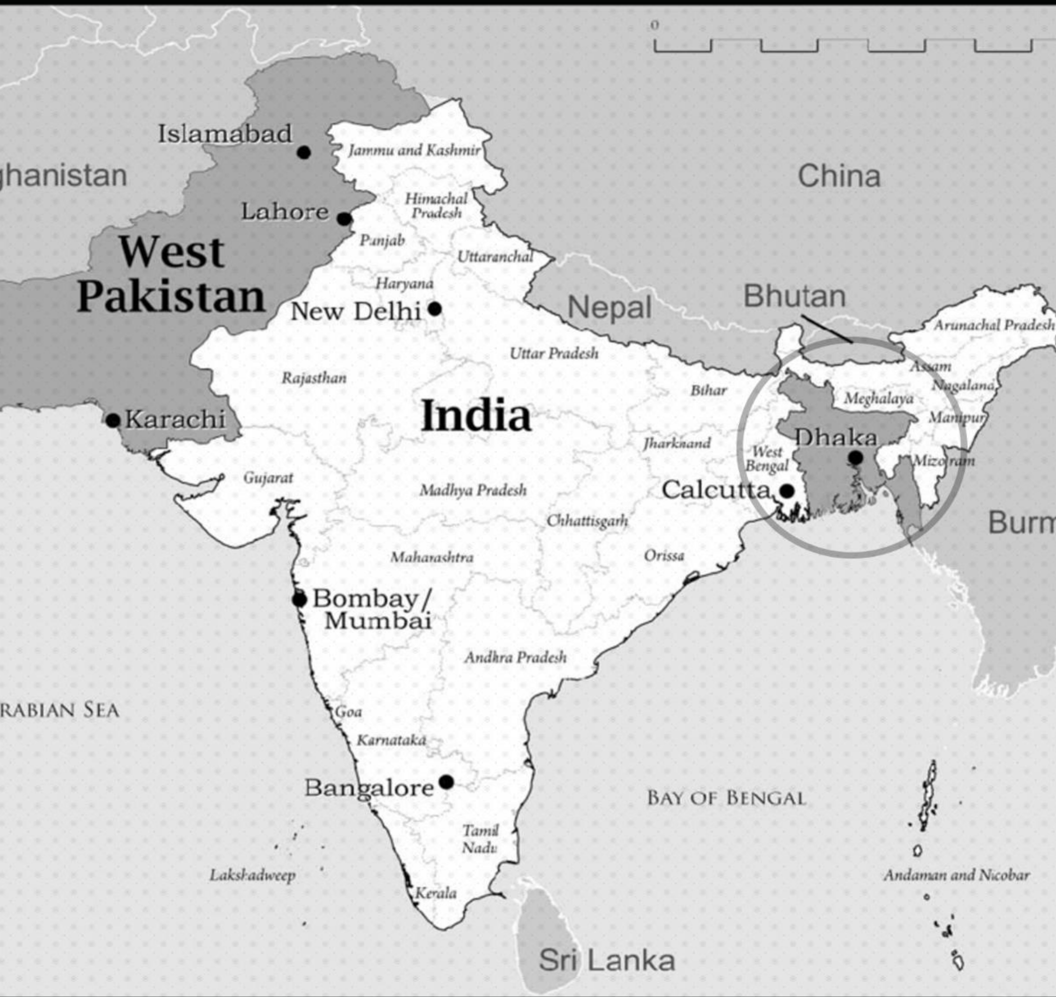

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে?

মুল

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ
অনুবাদ বিভাগ
আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

ঢাকার পতনের জন্য

দায়ী কে?

মুল

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ

অনুবাদ বিভাগ
আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

- **প্রথম প্রকাশ**
  রজব ১৪৪৪ হিজরী
  জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি

- **স্বত্ব**
  সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

- **প্রকাশক**
  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwaa.org
  টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1
  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org
  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই বইয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

– **কর্তৃপক্ষ**

সূচিপত্র

ভূমিকা.. ৭

দুই পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ....................................... ৮

ভাষার সমস্যা ১০

অপমান ও অপদস্থতা ১১

বাঙালি জাতীয়তাবাদ.. ১৪

মুজিবুর রহমানের আগে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ১৬

সম্পাদকের কথা

প্রিয় তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ'র '**ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে?**' গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় তিনি ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে? ইসলামের নামে যে পাকিস্তান দেশটি তৈরি হয়েছিল, ১৯৭১ সালে তা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য দায়ী কে ছিল?, পাকিস্তানে এই প্রশ্নের উত্তর, বাংলাদেশে এই প্রশ্নের উত্তর এবং ভারতে এই প্রশ্নের উত্তর কি?, আর তার প্রকৃত বাস্তবতা কি?, তা সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে আমরা ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে? তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে 'জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা'র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' এর গত ডিসেম্বর ২০২২ ইংরেজি সংখ্যায় "সুক্কুতে ঢাকাহ্ কা জিম্মাহ্দ্বার কোন?" (سقوطِ ڈھاکہ کا ذمہ دار کون؟) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির মূল বাংলা অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়দা ব্যাপক করুন! আমীন।

সম্পাদক
৪ই রজব, ১৪৪৪ হিজরী
২৭ই জানুয়ারি, ২০২৩ ইংরেজি

ঢাকার পতনের জন্য দায়ী কে?

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার যে মুসলিমরা পাকিস্তানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, কী কারণে সেই মুসলিমরাই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে? নিজেদের হাতে যে দেশটি তারা গড়ে তুলেছিল, পরবর্তীতে কেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল?!

এই প্রশ্নের সহজ কোনও উত্তর নেই। ১৯৭১ সালের মার্চে 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর আগেও পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সন্দেহাতীতভাবে পাকিস্তানপন্থী ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালি সৈন্য তাদের বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। অনেকেই পাকিস্তান রক্ষার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। তা সত্ত্বেও, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে যায় এবং 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে আবির্ভূত হয়।

'ঢাকা' পতনের জন্য দায়ী কে? ইসলামের নামে যে পাকিস্তান দেশটি তৈরি হয়েছিল, তা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য দায়ী কে ছিল?

পাকিস্তানে এই প্রশ্নের উত্তর: "শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব ছিলেন একজন বিশ্বাসঘাতক, যিনি ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।" পাকিস্তানে এই মতটিই প্রসিদ্ধ।

বাংলাদেশে এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ ভিন্ন: “৭১ -এর বছরকে ঢাকা পতনের বছর হিসেবে স্মরণ করা হয় না। বরং এটি বাংলাদেশের জন্মের একটি মাইলফলক। বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। এই যুদ্ধে মুজিবুর রহমান ছিলেন তাদের নেতা ও রাহবার।”

আর ভারতে প্রচলিত বিষয়টি হল - "৭১ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে ভারত জয়ী হয় এবং পাকিস্তান পরাজিত হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়।"

এই সমস্ত বিবরণ একে অপরের বিপরীত এবং স্বাভাবিকভাবেই সবগুলো সত্য হতে পারে না। তাহলে বাস্তবতা কি? এই তিনটি বর্ণনায় বাস্তবতার কিছু দিক থাকলেও, তিনটিই আসল বাস্তবতার মৌলিক উপাদান থেকে বঞ্চিত।

পাকিস্তানের দুই বাহুর (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। ভাষাগত, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বর্ণ ও বংশের পার্থক্য, রাষ্ট্রের সম্মতিতে সৃষ্ট আর্থনীতিক, সামাজিক এবং অবকাঠামো ও সম্পদের বৈষম্য - এই সব কারণ ও অজুহাত ১৯৭১ এ তাদের চেহারা দেখিয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা ৭১ -এর দুঃখজনক ঘটনা এবং তার সাথে জড়িত প্রধান চরিত্র ও মূল কারণগুলিকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করবো। আমরা দেখবো - কাদের জন্য এবং কী কী কারণে ঢাকার পতন হয়েছিল।

দুই পাকিস্তানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ

১৯৭১ সালে যা ঘটেছিল তার একটি প্রধান কারণ ছিল - পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমদের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট ও অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব। পূর্ব বাংলার মুসলিমদের অন্তরে পাকিস্তান নিয়ে খুব আশা ছিল। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রটি অস্তিত্বে আসার পরপরই তারা এই সদ্য অর্জিত সোনার পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। প্রথমদিকে এর কারণ ছিল ঐ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, নতুন রাষ্ট্রটি যার সম্মুখীন হয়েছিল।

১৯৪৯ সাল নাগাদ চালের দাম (পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য) সমগ্র বাংলায় প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছিল। খাদ্যমূল্য কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। স্বাধীনতার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলায় তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের চরম অবহেলা ও অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এটাই সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রথম কারণ ছিল।

পাকিস্তানের দুই প্রান্তের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ছিল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্যের ঐতিহাসিক কারণও ছিল। দেশের বামপ্রান্তে ডানপ্রান্তের তুলনায় অনেক ভালো নগরায়ন আগেই ঘটেছিল। শিল্প অবকাঠামো উপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুগের শিক্ষিত লোকদের একটি বড়ো অংশ এখানেই বসবাস করতো। এছাড়া দেশ বিভাজনের পর হাজার হাজার শিক্ষিত ও ধনী মুসলিম ভারত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করে।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ পূর্ব বাংলা) অসংখ্য হিন্দু শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী ভারতে চলে যায়। তাদের সাথে তাদের বিপুল পুঁজিও বাংলা ছেড়ে যায়। একারণে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) শুরু থেকেই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। পক্ষপাতদুষ্ট ও ইচ্ছাকৃত বৈষম্যমূলক মনোভাব এসব সমস্যাকে আরও প্রকট করেছে।

দেশভাগের পরপরই ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলাকে তার একমাত্র রাজস্বের উৎস 'বিক্রয় কর' (sales tax) থেকে বঞ্চিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাতরা 'বিক্রয় কর'কে প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ার থেকে বের করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিয়ে দেয়। অথচ ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় বাজেট থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০% এরও বেশি শুধু রাজধানী করাচিতে ব্যয় করেছিল। করাচিতে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং একটি সমুদ্রবন্দর থাকলেও, পূর্ব বাংলায় এর কোনোটিই ছিল না। দেশ বিভাজনের আগে বিশ্বের পাট উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ পূর্ববঙ্গ উৎপাদন করতো। এমনকি পাকিস্তানের অংশ হওয়ার পরেও, পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসতো পূর্ববঙ্গের উৎপাদিত পাট থেকে। রাজস্বের সিংহভাগ পূর্ব বাংলা দিলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি পূর্ব বাংলার চেয়ে বেশি ছিল।

অতঃপর আইয়ুব খানের অধীনে বাঙালিরা অখণ্ড পাকিস্তানে তাদের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার দেখতে শুরু করে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পাকিস্তানের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭%। দুঃখজনকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে তা ছিল মাত্র ৩.৬%। এমন অনেক নথিপত্র এবং রেকর্ড রয়েছে, যা পূর্ব পাকিস্তানের অবিশ্বাস্য বৈষম্যের শিকার হবার বর্ণনা দেয়। এই তীব্র বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী

সৃষ্টি করেছিল। অখণ্ড পাকিস্তানের ২৪ বছরের পুরোটা সময় ধরে এরা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছিল।

ভাষার সমস্যা

পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প সময়ের মধ্যে, মার্চ ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দু'কে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। এ ঘোষণায় বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ছাত্রসমাজ হতবাক হয়ে যায়। এই ঘোষণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের (বাঙালিদের) দৃষ্টিতে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অনুভূতির প্রতি মূল্যহীনতা ও অবমূল্যায়নের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

আবুল মনসুর আহমদ একজন বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি বিভাজন-পূর্ব বাংলায় 'কৃষক প্রজা পার্টি' এবং 'কংগ্রেসের' সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে জিন্নাহর মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। 'উর্দু' ভাষা নিয়ে জিন্নাহর ভুল অবস্থানের কারণে তার নিজের ক্ষোভ মিশ্রিত অবস্থানের কথা এভাবে লিখেছেন:

"ঢাকায় কায়েদে আজমের বক্তৃতার সময় দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাকে দুঃখ দিয়েছিল তা হল – 'বাংলা ভাষা' সম্পর্কে তাঁর মতামত। আমি জিন্নাহকে পঁচিশ বছর ধরে চিনি। এই পুরো মেয়াদে আমি মাত্র পাঁচ বছর রাজনীতিকভাবে তার বিরোধিতা করেছি। বাকি বিশ বছর আমি তার সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলাম। এত স্পর্শকাতর ইস্যুতে তাঁর কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য আমি কখনোই আশা করিনি। তিনি নিজেও না জানেন বাংলা, না জানেন উর্দু।....." (এ এম আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)

'উর্দু'র সমর্থনে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, নাজিমুদ্দিন এবং অন্যান্য পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের বক্তব্য পূর্ব বাংলার জনগণকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল যে, তারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, দেশের বিষয়ে তাদের মতামতের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। তারা শুধু রাজনীতিক ও আর্থনীতিকভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিল

না, বরং সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকভাবেও পাকিস্তানি হিসেবে অবাঙালি সংখ্যালঘুদের চেয়ে নিম্ন স্তরে ছিল।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষায় 'বাংলা ভাষা' অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালিদের বিক্ষোভে, পুলিশ বিনা উসকানিতে নির্বিচারে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়। ফলে পাঁচ বাঙালি যুবক নিহত হয়। এদের তিনজন ছিল ছাত্র।

এই ট্র্যাজেডির পর জিন্নাহর ১৯৪৮ সালের ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় 'বাঙালি জনগণের ক্ষুদ্র প্রতিবাদ' হিসাবে শুরু হওয়া আন্দোলনটি হঠাৎ করেই 'সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনে' পরিণত হয়। কমিউনিস্ট বাঙালি লেখক বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন:

"২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিবর্ষণ 'বাংলা ভাষা আন্দোলন'কে রাতারাতি 'গণআন্দোলনে' রূপান্তরিত করেছে, যা বর্তমান সরকারকে উৎখাত করতে চায়। পাকিস্তান সরকারের আঞ্চলিক চরিত্র জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, শুধু কয়েকটি মৌলিক আঞ্চলিক অধিকারের জন্য নয়, বরং ভাষাগত ভিত্তিতে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে, একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে উঠার জন্য নিজেদের লড়াই করার প্রয়োজন রয়েছে।"

২১শে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনাগুলো পূর্ব বাংলার সামগ্রিক রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনার পর পূর্ব বাংলায় 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' চরমে পৌঁছেছিল। ১৯৬০-এর দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট বা অন্য কোনও জাতীয় প্রতীকে বাঙালিদের কোন ব্যবহার কোথাও দেখা যায়নি।

অপমান ও অপদস্থতা

মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙার এবং দূরত্ব তৈরি করার সর্বোত্তম উপায় হল - অবমাননা। ১৯৪৬ সালে ঈমানী শক্তিতে নিবেদিত প্রাণ বাঙালি মুসলিমরা হিন্দুস্তানের মুসলিমদের জন্য একটি নতুন ভূমি পাকিস্তান তৈরির পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনীতিক নেতৃত্ব এবং তাদের বাঙালি সমর্থকরা মুসলিম বাঙ্গালিদের কেবল অপমানই করেছে। বাংলার মুসলিমরা সমৃদ্ধ ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বলিত না হওয়াতে এরা ইসলামের সাথে বাঙালিদের

সম্পর্ককে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এটা বাঙালি মুসলিমদেরকে আরও বিমুখ করেছে। সে সময়ে বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই খাদ্য সংকট, বেকারত্ব ও ভাষা আন্দোলনের মতো সমস্যায় জর্জরিত। এ অবস্থায় অবাঙালি শাসক, অভিজাত পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের অসাধু ও নীতিহীন আচরণ ছিল 'কাটা গায়ে নুনের ছিটা'র নামান্তর।

অবাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বিশেষ করে উর্দু, পাঞ্জাবি, গুজরাটি এবং সিন্ধি ভাষাভাষীদের মধ্যে অহঙ্কার ও বাঙালি-বিরোধী কুসংস্কারই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ঘটনা নিয়ে আলোচনার সময় এই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কারণটিকে সবসময় উপেক্ষা করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে পূর্ব বাঙালিদের বিষয়ে অনেক কুধারণা ছিল। 'বাঙালিত্বের আভাস' আছে এমন যেকোনো কিছুর প্রতি তাদের ঘৃণা ছিল স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। সেইসাথে পূর্ব বাংলার মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি তাদের ক্রমাগত অবমাননা ও সমালোচনা, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বাঙালিকে পশ্চিম পাকিস্তানি ও অবাঙালিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলিমদের কথিত 'হিন্দু-সদৃশ পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং ভাষা ইত্যাদির জন্য উপহাস করা হতো।

'কুদরতুল্লাহ শাহাব' নামের একজন অবসরপ্রাপ্ত অবাঙালি সিনিয়র আমলা এবং কূটনীতিক পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাতদের (সামরিক ও রাজনীতিক নেতৃত্ব, নীতিনির্ধারক এবং আমলাতন্ত্রের) অনৈতিক এবং বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে ক্ষতি হয় সংক্ষেপে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"একদিন করাচিতে অর্থমন্ত্রী গোলাম মুহম্মদের অফিসে একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। করাচিতে সরকারি অফিস এবং আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টগুলির জন্য স্যানিটারি সরঞ্জাম সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনার জন্যই এই বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (বাঙালি) ঢাকার জন্য স্যানিটারি সরঞ্জাম কেনার বাজেট অনুমোদনের দরখাস্ত করেন। এই আবেদনে উচ্চস্বরে হাসির রোল

উঠল এবং এক ভদ্রলোক মজা করে বললেন, 'বাঙালিরা কলাগাছের পেছনে প্রয়োজন সারে। তারা কমোড আর ওয়াশ বেসিন দিয়ে কী করবে?।"

এটি সেসময়ের কথা যখন লিয়াকত আলী খান দেশের প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৫১) ছিলেন। শাহাবের মতে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তান তার অবচেতনে বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল।

আতাউর রহমান খান (বাঙালি), ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি তার লেখায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের অহঙ্কারী মনোভাব এবং পূর্ব বাংলার উন্নয়নে তাদের অনাগ্রহ ও অসহযোগিতার বর্ণনা তুলে আনেন। এই নেতাদের মধ্যে কয়েকজন তাকে প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানিদের সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত'।

কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তান কখনই পাকিস্তানের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না'। পশ্চিম পাকিস্তানের একজন রাজনীতিবিদ, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, একবার প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, 'বাঙালি মুসলিমরা খতনাবিহীন এবং প্রায় হিন্দু'।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই শক্তিশালী শ্রেণিটি প্রায়ই বাঙালিদের ঈমান ও ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতো। বিখ্যাত পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস (Anthony Mascarenhas) তার 'দ্য রেপ অফ বাংলাদেশ' (The Rape of Bangladesh) বইয়ে লিখেছেন:

"বাঙালি মুসলিমদের ঈমান ও তাকওয়া নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত শ্রেণির সন্দেহের অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশও ছিল। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের পাঞ্জাবি গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নুন একবার বলেছিলেন, 'বাঙালিরা তো 'অর্ধেক মুসলমান''। তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন যে, 'তারা তাদের মুরগিকে হালাল করার (হালাল নিয়মে জবাই করার) কষ্টটুকু করে না'। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ভাসানী এই অসম্মানের জবাব দিয়েছিলেন এই কথায়: "নিজেদের মুসলিম প্রমাণ করার জন্য কি আমাদের এখন লুঙ্গি তুলে দেখাতে হবে?"

বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে কখনও 'খতনাবিহীন' বলে অপবাদ দেয়া হয়েছে, আবার কখনও 'খতনাকৃত হিন্দু' বলে উপহাস করা হয়েছে।

তাদের এই কুসংস্কারের কারণে, প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা - বাঙালিরা যাতে পাকিস্তানে রাজনীতিক ক্ষমতার কোনও বড় অবস্থান অর্জন করতে না পারে - সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

লিয়াকত আলী খানের সরকার ফজলুল হক, এইচ এস সোহরওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী এবং আবুল হাশিমের মতো বাঙালি রাজনীতিবিদদের পাকিস্তানের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় কোনও কমতি করেনি!

১৯৭১ সালে ভুট্টো এবং সামরিক জেনারেলরা একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছিল। মুজিব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাতদের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একজন বাঙালিকে কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব এবং অগ্রহণযোগ্য। তাই তারা সামরিক শক্তি ও বল প্রয়োগে পূর্ব পাকিস্তানকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ২৪ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি বাঙালিদেরকে 'নিকৃষ্ট' মনে করে তাদের অপমান করেছে। তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাদের শোষণ করেছে। রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ থেকেও বঞ্চিত করেছে।

যখন কেউ এই ঘটনাগুলো এবং এর প্রতিফলিত বাস্তবতার দিকে তাকাবে, তখন সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে - এই ধরনের বিষাক্ত আচরণের পরে, পাকিস্তানকে ভাঙ্গন থেকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ কোনও স্বাধীন জাতি, এমনকি কোনও স্বাধীন মুসলিমও এ ধরনের অপমান মেনে নিতে পারে না।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্ব থেকে অপমান ও বৈষম্যমূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালিরা নিজেদের 'বাঙালি মুসলিম পরিচয়'কে শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ

করে। কিন্তু তারা তাদের এই উদ্দীপনাতে বড়ো বড়ো ভুল করে ফেলে, যা অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনে। এই ভুল আজও আমাদের পিছু ছাড়েনি।

তাদের কাছে বিদ্যমান 'সমৃদ্ধ ইসলামী ঐতিহ্যের' দিকে না তাকিয়ে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার দিকে তাকাতে থাকে। তারা ভুলে গিয়েছিলো যে, বাংলাকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনীতিক ইউনিট হিসাবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভারতের মুসলিম যুগ থেকেই ছিল। বাংলার স্থানীয় ভাষা, যেটি বহুকাল ধরে ব্রাহ্মণদের শাসনে অবহেলিত ছিল, মুসলিম শাসকরা এর বৃদ্ধি ও বিকাশে ভূমিকা রেখেছিলেন।

৫০ ও ৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের মিডল ক্লাসের বুদ্ধিজীবীরা 'ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সংস্কৃতি'কে (যা ছিল তথাকথিত বাঙালি নবজাগরণের ফল) 'বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সভ্যতা' নামে নতুন মোড়কে মুড়িয়ে দেয়। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' এই নব উদ্ভাবিত চেতনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই চেতনা বাঙালিদের মস্তিষ্কে এমন এক সময়ে প্রবেশ করে, যখন তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা তাদের নিয়ে উপহাস করছিল। তাদেরকে অপমান করছিল এবং তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছিল। তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছিলো। এই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিই তাদেরকে তাদের রাজনীতিক পরিচয় এবং তাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

আজ 'বাঙালি জাতিসত্তা'র এই চেতনাটি সীমা অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষ, ইসলামবিরোধী এবং চরম জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে পরিণত হয়েছে। আজ এই মতাদর্শ কি রূপ নিয়েছে সেটা বুঝার জন্য একটু পিছনে তাকালেই হবে। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া শাহবাগের নাস্তিক আন্দোলন বর্তমান মতাদর্শের স্পষ্ট প্রতিফলন। আর শুধু শাহবাগ আন্দোলনই নয়, বাংলাদেশের বড়ো বড়ো অনেক সমস্যা ও বিভাজন এই বিষাক্ত মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

যাইহোক ৫০ ও ৬০ এর দশকে এই মতবাদের আক্রমণাত্মক 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং ইসলামবিরোধী দিকটি সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার ছিল না। যদিও এই মতবাদের তৈরিকারী, রূপায়ণকারী এবং উপস্থাপনকারী অনেক নেতাই এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার ইচ্ছা অন্তরে লালন করতো। একজন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানির জন্য 'বাঙালি জাতীয়তা'র চেতনাটি ছিল কেবল নিজের পরিচয় এবং নিজের ভূমিতে নিছক

গর্ববোধের বহিঃপ্রকাশ। বাঙালী মুসলিমরা না কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আর না কখনও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের চেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

গ্রাম-গঞ্জে, অলি-গলিতে বসবাসকারী সাধারণ বাঙালিরা সেক্যুলারও ছিল না, ইসলামবিরোধীও ছিল না। হ্যাঁ, ক্রমাগত বৈষম্য ও বিদ্রূপের মুখোমুখি হতে হতে তাদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিল – এটা সত্য। আর 'বাঙালি জাতিসত্তা'র চেতনা তাদের কাছে একটি বাতিঘরের মতো ছিল। এটা থেকে তারা তাজা বাতাসের শ্বাস নিত এবং তাদের ক্ষয়ে যাওয়া আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করতো। সহজ কথায় এভাবে বলা যায় যে - বাংলার মুসলিমদের ন্যায্য ও সত্য অভিযোগ, ক্ষোভ এবং পরিচয় সংকটের সমস্যাকে সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে।

একটি সাধারণ (সম্মিলিত) ধর্মের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। তার ডান ও বাম অংশের মধ্যে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার দূরত্ব ছিল। যে মুহূর্তে এদেশের দুই বাহুতে বসবাসকারী মানুষের কাছে ধর্মের চেয়ে জনগণের বর্ণ-বংশ ও জাত-পাত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তখনই পাকিস্তান চেতনার মৃত্যু হয়েছিল। ভারত তাতে বসবাসকারী বাঙালি ও পাঞ্জাবি, তামিল ও গুজরাটি, গন্ডা ও মারোয়ারি এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যবধান ও দূরত্ব মিটিয়েছে বা চেষ্টা করেছে। কিন্তু পাকিস্তান পারেনি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাতরা কখনোই এই দূরত্ব দূর করার চেষ্টা করেনি। কখনও তার প্রয়োজন বা ইচ্ছা অনুভবও করেনি। দুঃখজনক ঘটনা এই যে, হিন্দু ভারত তার বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম এবং জাত-পাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা সত্ত্বেও জাতির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পাকিস্তান তা করতে পারেনি।

মুজিবুর রহমানের আগে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ - উভয় দেশেই এই মতটি ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় যে, মুজিবুর রহমানই প্রথম ব্যক্তি যিনি পূর্ব বাংলাকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশ হিসেবে রূপ দিয়েছেন বা কল্পনা করেছিলেন। এই ধারণাটি একেবারেই ভুল। মুজিবের আগেও অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এ মত প্রকাশ করেছিলেন। এটাও

প্রমাণিত যে, মুজিব জাতীয় নেতা হওয়ার অনেক আগেই পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বাঙালি বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলো।

১৯৬৬ সালে মুজিবের 'ছয় দফা কর্মসূচি' এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরও স্বায়ত্তশাসনের দাবির অনেক আগে, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আতাউর রহমান খান পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ঢাকাতে আয়োজিত 'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে' এই দাবি করেছিলেন। সম্মেলন কনভেনশনে তার বক্তৃতার সময়, তিনি শ্রোতাদের কাছে নেদারল্যান্ডের উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। কিভাবে ১৯ শতকের প্রথমার্ধে নেদারল্যান্ড বেলজিয়ামকে স্বায়ত্তশাসন দিতে অস্বীকার করার ফলে, বেলজিয়ামের স্বাধীন রাজ্য অস্তিত্ব লাভ করে – সেটা তিনি আলোচনায় তুলে আনেন।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান অনুমান করে বলেছিলেন যে, 'বাঙালিরা হিন্দু সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চায়'। আতাউর রহমান খান এর জবাবে বলেছিলেন:

"আপনি বাঙালিদেরকে জানেন না। এরা কাউকে ভয় পায় না। বাংলা কখনোই পুরোপুরিভাবে না পাটলিপুত্রের (পাটনার) অধীনতা মেনে নিয়েছে, না দিল্লির। বাংলা তার স্বাধীন অবস্থান হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছে। এখন যদি আপনি আমাদেরকে আলাদা হতে বাধ্য করেন, তবে আমরা আলাদা হয়ে যাবো। বাংলা কারও দাসত্ব করতে চায় না।"

৩ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে 'যুক্ত ফ্রন্ট' পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করে, যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ফজলুল হক। করাচির কেন্দ্রীয় সরকার এই পরাজয়কে সদয়ভাবে মেনে নেয়নি। কথিত আছে যে, ২৩ মে ১৯৫৪ তে সম্প্রচারিত 'নিউ ইয়র্ক টাইমসের' একটি সাক্ষাতকারে ফজলুল হক সাক্ষাতকার গ্রহণকারী সাংবাদিক জন ডি. ক্যালাহানকে বলেছিলেন যে, 'পূর্ব বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে চায়'। তার উপর এই অভিযোগও আনা হয় যে, তিনি ক্যালাহানকে বলেছিলেন:

"স্বাধীনতা (এর জন্য সংগ্রাম ও লড়াই) হবে প্রথম কাজ, যা আমার মন্ত্রণালয় করবে।”

১৯৫৪ সালের ৩০ মে, ফজলুল হকের পক্ষ থেকে আমেরিকান ডেইলিতে আগের দিনের সম্প্রচারগুলোর তীব্র অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল গুলাম মুহাম্মদ ফজলুল হকের মন্ত্রিত্ব বাতিল করে দেন এবং পূর্ব বাংলাকে গভর্নর শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।

বামপন্থী কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের সাথে মাওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের কেউ কেউ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান ও ভারত উভয়ের আধিপত্য থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালের ১৭ই জুন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথমবারের মতো এই বিভাজনের হুমকি দেন। ভাসানী ছিলেন একজন জনপ্রিয় নেতা, যিনি আসামে মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তাঁর দীর্ঘ ও ধৈর্যশীল সংগ্রামে অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন।

১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ‘কুল পাকিস্তান সাকাফাতি কনফারেন্স’ (গোটা পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্মেলন)-এ মাওলানা ভাসানী আবারও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 'যদি পূর্ব বাংলায় শোষণ অব্যাহত থাকে, তবে হতে পারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একদিন পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে বাধ্য হবে'।

তিনি 'আসসালামু আলাইকুম পশ্চিম পাকিস্তান!' বলে এক প্রকারে নিয়মতান্ত্রিক বিদায়ও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি যিনি তার পশ্চিম শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি করেছিলেন। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান কল্পনার মৃত্যু হয়ে গেছে।

(চলবে...)

(প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ 'ইনশাআল্লাহ' জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যায় পেশ করা হবে।)